কলকাতা বেতার

A Slice of Calcutta's Cultural History

২০১৮ সালের দূর্গাপূজার সময় আমি পাড়ার পূজোতে কলকাতা বেতার নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। সেই প্রোগ্রামের কথা শুনতে শুনতে সুব্রতদা, Society for Preservation, Calcutta-র মেম্বার, সুব্রত সরকার, আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন - কলকাতা বেতারের কি সত্যিই এই শহরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা বিশেষ জায়গা আছে ? সুব্রতদার সেই প্রশ্ন নিয়েই আজ আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে এসেছি। প্রশ্নের উত্তরটা আপনারাই বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি শুধু কেন এতবড় দাবী করছি, তার স্বপক্ষে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে রাখবো।

যখন দাবী করছি কলকাতা বেতার কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম স্তম্ভ, তখন কলকাতা বেতার বলতে আমি ঠিক কি বলতে চাই, সেটা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পেয়েছি বিবিধ ভারতী, নব্বুই-এর দশকে এসেছে আকাশবাণীর এফ. এম, এখন তো অনেক এফ. এম. রেডিও স্টেশন হয়ে গেছে শহরে, এই শতাব্দীর শুরুতে পাচ্ছি কম্পুটারের মাধ্যমে রেডিও - Podcasting, audio-streaming - এইসব রেডিও ভবিষ্যতের কলকাতার ইতিহাসে জায়গা পাবে কিনা জানিনা। বেতার বলতে আমি বুঝি Indian Broadcasting Company-র সেই অভিনব কর্মকান্ড, যা ১৯২৭ সালে, ২৬শে অগস্ট, একটা নতুন প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল - সংক্ষেপে All India Radio Calcutta, বা আকাশবাণী কলকাতা।

Indian Broadcasting Company তাদের প্রথম রেডিও স্টেশন বম্বে শহরে খুললেও, কলকাতা দাবী করতে পারে, ভারতবর্ষে wireless transmission এই শহরেই শুরু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্যারিসে গবেষণা করতে গিয়ে, পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র এক নতুন প্রযুক্তির সন্ধান পেলেন - wireless telegraphy-র মাধ্যমে জনসংযোগ। বেতার নামটা সেখান থেকেই এসেছে - wireless, মানে বিনা তার সংযোগে - অর্থাৎ বে-তার। বেতার শব্দটাও খুব সম্ভবতঃ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, তবে এই তথ্যের প্রামাণ্য সূত্র আমি এখনও পাইনি।

১৯২৩ সালে দেশে ফিরে, ডাঃ শিশির মিত্র স্যার আশুতোষের সাহায্যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে physics Department-এ Wireless Section তৈরী করেন আর কিছুদিনের মধ্যেই নিজের wireless Laboratory-তে একটি medium wave transmitter বানিয়ে ছাত্রদের নিয়ে শুরু করলেন ভারতবর্ষের প্রথম বেতার সম্প্রচার সংস্থা - Radio Club of Bengal। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে রেডিও ক্লাবের পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয়। তখন শুধুমাত্র মার্কনী কোম্পানীর রেডিও বাজারে পাওয়া যেত, নাম ছিল মার্কনী ক্রিস্টাল সেট। শ্রোতাকে কানে হেডফোন লাগিয়ে সম্প্রচার শুনতে হতো, সবাই মিলে একসঙ্গে শোনা যেতনা। কলকাতায় খুব সামান্য কজনের কাছেই সেরকম রেডিও সেট ছিল। কিন্তু শিশির মিত্রর Radio club-এর জনপ্রিয়তা এত দ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, একমাসের মধ্যে বম্বে আর মাদ্রাজেও একটি করে রেডিও ক্লাব তৈরী হয়ে যায়।

১৯২৪ সাল থেকে, ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন শহরের রেডিও ক্লাবগুলিকে, খুব অল্প শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে, বেতার সম্প্রচারের অনুমতি দিতে শুরু করে। ১৯২৫ সালে, ডাঃ মিত্র অনুমতি জোগাড় করেন, একটি তুলনায় উচ্চশক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের। সেই ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে, তিনি শুধুমাত্র কলকাতা নয়, পশ্চিমে বারাণসী আগ্রা পর্য্যন্ত আর পূর্বে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত প্রোগ্রাম শোনাতে পারতেন।

মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার দিয়ে রেডিও ক্লাবের প্রথম দিনের প্রোগ্রামে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক অখ্যাতনামা যুবক হীরেন বসু। কেমন করে তিনি প্রথম দিনের বেতার সম্প্রচারে গান করতে পেরেছিলেন সেকথা স্মৃতিচারণ করে হীরেন বসু লিখছেন - "১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী আমার পিতার মৃত্যু হয়, তখন আমি কলেজ পড়ুয়া ছেলে, বয়স উনিশ বছর তিন মাস। লেখাপড়ায় সাধারণ মানের হলেও, বন্ধু মহলে গানের জন্য খ্যাতি ছিল। সংসারের চাপে কিছুদিনের মধ্যেই লেখাপড়া ছেড়ে, ঢুকে পড়লাম একটা সরকারী অফিসে, মাসিক বেতন তিরিশ টাকা। মাস গেলে ওই টাকা হাতে পেয়ে কান্না পেয়ে যেত। এক বন্ধুর সুবাদে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে গান শোনাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার গান তাঁর ভালো লেগেছিল, প্রায়ই ওঁর ঘরে গিয়ে বসে থাকতাম, গানও শোনাতাম, বাড়ীর অবস্থাও বলতাম।

সেদিন আমরা ক'জন, আচার্য্য রায়ের ঘরে বসে মুড়ি নারকোল খাচ্ছি, হঠাৎ ঝড়ের মতো একদল ছেলে ঘরে ঢুকে বললে - এখানে কেউ গাইতে জানেন ? সবাই আমার দিকে তাকালো, তারা বললে - শিগগিরী আসুন, ডাঃ মিত্র ডাকছেন। আচার্য্য রায় আমাকে বললেন - যা, যা, বেতারে গান গেয়ে আয়, খুব ভালো করে গাইবি, দুপয়সা পেয়েও যেতে পারিস্। সেই সন্ধ্যায়, কলকাতা সায়েন্স কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে, বেতারযোগে গান, আবৃত্তি, বার্তা প্রচারের আয়োজন ঘটালেন, ডাঃ শিশির মিত্র মহাশয়। সারা কলকাতায় শ্রোতারা সেই অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। ১৯২৫ সালের সেই চমকপ্রদ ঘটনা, আমার জীবনেরও মোড় ঘুরিয়ে, এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করেছিল।

দুবছর পরে, যখন কলকাতায় রেডিও স্টেশন চালু হয়, তখন হীরেন বসু Indian Broadcasting Company-তে যোগদান করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি গীতিকার-সুরকার হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া একটি গান এখনও দূর্গাপূজার সময় পাড়ায় পাড়ায় শোনা যায় - শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। গানটা প্রথম আকাশবাণীর জন্য গেয়েছিলেন ধীরেন দাস, অনুপকুমারের বাবা। সবাক যুগে সিনেমা পরিচালকরূপেও হীরেন বসু সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ শুরু কিন্তু কলকাতা রেডিও থেকেই।

ততদিনে ইংল্যান্ডে, রেডিও চালু হয়ে গিয়েছিল - বৃটিশ ব্রডকাস্টিং সার্ভিস, সংক্ষেপে, BBC নাম দিয়ে একটি প্রাইভেট কোম্পানী ১৯২২ সাল থেকেই নিয়মিত broadcasting করছে। ১৯২৬ সালে, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত general Strike-এর সময়, বিক্ষোভের আগুন নেভাতে, BBC-র উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও ছিল। ভারতে তখন একটু একটু করে স্বাধীনতার দাবী জোরালো হয়ে উঠছে। বৃটিশ সরকার ভাবলেন, ভারতেও একটি রেডিও কোম্পানী গড়ে তুলতে পারলে তাঁদের সুবিধা হবে। ১৯২৬ সালে October মাসে BBC-র এক অধিকর্তা, C.C. Wallick-কে কলকাতায় পাঠানো হল, ভারতবর্ষে বেতার সম্প্রচার কতটা বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে পারে, খতিয়ে দেখার জন্য। ওয়ালিক সাহেব এসে হাইকোর্টের পাশে টেম্পল চেম্বারে, পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন একটা ছোট্ট ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে, সন্ধ্যেবেলায় ঘন্টাখানেক বেতারমাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করলেন। কলকাতার মাত্র কয়েকজন লোক সেসব প্রোগ্রাম কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনতে পেত। কিন্তু

সারা শহরজুড়ে উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল। Wallick-সাহেবকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার নামে একজন সঙ্গীত পরিচালক, যিনি সেসময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সীতা নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করে খুব নাম করেছেন। নৃপেন্দ্রনাথ ভাল ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন, আর সাহেবী স্কুলে পড়েছিলেন বলে, ভাল ইংরিজী বলতে পারতেন।

কিন্তু ভারতের প্রথম রেডিও স্টেশন হবার ঐতিহাসিক সম্মান কলকাতা পায়নি কারণ ইতিমধ্যে বম্বের প্রখ্যাত পার্সী ব্যবসায়ী, F. M. Chinoy-এর নেতৃত্বে, Indian Broadcasting Company নামে একটি বেসরকারী সংস্থা খুলে সরকারের চুক্তি করলেন ভারতে রেডিও সম্প্রচার করার। সেই কোম্পানীর উদ্যোগে, ১৯২৭ সালে ২৩শে জুলাই, বড়লাট লর্ড আরউইন উদ্বোধন করলেন বম্বে রেডিও স্টেশন। কলকাতায় রেডিও স্টেশন খুলেছিল ঠিক একমাস পরে, ২৬শে অগস্ট। Station Director হলেন স্বয়ং C.C. Wallick । বাংলা প্রোগ্রামের জন্য অধিকর্তা নিয়োগ করা হলো নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারকে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানেই তিনি শ্রোতাদের চমকে দিয়েছিলেন - স্টুডিওতে একসঙ্গে বসিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিস্ আঙুরবালা আর মিস প্রফুল্লবালার মতো চারজন বিখ্যাত শিল্পীকে, গল্প পড়ার জন্য এনেছিলেন সেকালের নামকরা সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। প্রোগ্রাম শুরু হয় দিনেন্দ্রনাথের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। কোন্ গান তিনি করেছিলেন রেডিও স্টেশনের পুরানো রেকর্ড থেকে এখন পর্যন্ত খুঁজে পাইনি, তবে কয়েকমাস পরেই তিনি চারটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রামাফোন কোম্পানীর জন্য রেকর্ড করেন, কিছু পুরাণো লেখা থেকে আমার মনে হয়েছে তার মধ্যে থেকে এই গানটা দিয়ে বোধহয় কলকাতা বেতারের শুরু । গানটি ডাঃ শৈলশেখর মিত্রের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে শোনাচ্ছি -

আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে - দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রেডিও বিনোদনের একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিলেও, সেসময় কলকাতা শহরে বিনোদনের অভাব ছিলনা। উৎসব উপলক্ষ্যে বাইনাচ, খেমটা, শীতকালে বড় বড় বাড়ীতে গানের জলসা, আর সারা বছর ধরে থিয়েটার তখন বাঙালীর মন জুড়ে রয়েছে। কলকাতায় মিনার্ভা, স্টার ছাড়াও বেশ কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ খুলে গেছে, তার মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্তর ন্যাশনাল থিয়েটার সবথেকে জনপ্রিয়, কারণ সেখানে থিয়েটারের সঙ্গে বিদেশ থেকে আনা ছোট ছোট সিনেমাও দেখানো হয়। ম্যাডান

কোম্পানী গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে বিদেশী নির্বাক সিনেমা - সেকালের নাম বায়স্কোপ - দেখায়। কলকাতাতেও নির্বাক সিনেমা বানানো শুরু হয়েছে। সপরিবারে থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপ দেখতে যাওয়া তখন একটা পারিবারিক উৎসব। সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য নতুন বিনোদন বাজারে এসেছে - গ্রামাফোন রেকর্ড। গ্রামাফোন কোম্পানী রেকর্ড কেনা সহজ করে দিতে বাড়ীতে বাড়ীতে ফেরি করে রেকর্ড বেচার ব্যবস্থাও করেছে। প্যারাম্বুলেটারের মতো একটা ছোট গাড়ীতে একখানা চকচকে পেতলের চোঙাওয়ালা গ্রামাফোন মেশিন আর দু-চার বাক্স রেকর্ড নিয়ে কোম্পানীর ফেরিওয়ালা - রেকর্ড নিবেন - নতুন গানের রেকর্ড - ডাক দিয়ে দুপুরে গলি গলিতে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ীর বৌ-মেয়েরা, যাঁরা গান শুনতে ভালবাসেন, মহা উৎসাহে পছন্দ করে রেকর্ড কিনছেন। কিছু কিছু বাড়ীতে রেডিও সেট কেনা হয়েছে, কিন্তু বাড়ীর কর্তা ছাড়া অন্যদের চালাবার অনুমতি নেই। এতো রকমের চ্যালেঞ্জের মধ্যে শুরু হলো কলকাতা রেডিও।

Indian Broadcasting Company মালিকরা প্রথম থেকেই, বাংলা অনুষ্ঠানের ওপর জোর দিয়েছিলেন। নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার সহকারীরূপে নিয়ে এলেন বিখ্যাত সঙ্গীতকার রাইচাঁদ বড়ালকে। সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন কাজী নজরুল ইসলাম, দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পন্ডিত, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট যোগেশচন্দ্র বসু। ইনিই গল্পদাদুর আসরের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা ঘোষকের কাজের জন্য রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে নেওয়া হলো। ঘোষকের কাজ ছাড়াও রাজেন সেন খেলার প্রোগ্রামের দিকটা দেখতেন, তিনি ১৯১১ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের হাফব্যাক ছিলেন। এলেন সাহিত্যিক ও হাসির গানের সুবিখ্যাত গায়ক নলিনীকান্ত সরকার, সুপ্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী গায়ক পন্ডিত হরিশচন্দ্র বালী, প্রোগ্রাম Assistant-এর পদে নিয়োগ করা হলো হীরেন বসুকে, রেলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে, প্রোগ্রাম ডাইরেক্টারের সহকারী হয়ে যোগ দিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আর এলেন বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, যিনি রেডিওর শ্রোতাদের কাছে বাণীকুমার ছদ্মনামে বেশী পরিচিত হয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই যখন **বেতার জগৎ** পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু হলো, নৃপেন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মহাস্থবির জাতক-এর লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে **বেতার জগৎ** সম্পাদনার জন্য নিয়ে আসেন। বছরের শেষভাগে এলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। পঙ্কজ মল্লিক অবশ্য কোনোদিনই স্থায়ীভাবে রেডিওতে চাকরী করেননি।

অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনতে প্রোগ্রাম পরিচালকরা প্রথম থেকেই ঠিক করে নিলেন সমাজের সমস্তবর্গের, বিশেষ করে যাঁদের বিনোদনের সুযোগ সীমিত, তাঁদের জন্য প্রোগ্রাম করবেন। তাই শুরু থেকেই প্রোগ্রামের লিস্টে দেখতে পাই মহিলাদের জন্য মহিলা মজলিশ, বাচ্চাদের জন্য গল্পদাদুর আসর, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যার্থীমন্ডল, শহরতলীর শ্রোতাদের জন্য পল্লীমঙ্গল আসরের মতো প্রোগ্রাম। তাছাড়া দেশবিদেশের খবরাখবর, নানা ধরণের সঙ্গীতের আসর, মঞ্চের নাটক সম্প্রচার, এসব তো ছিলই। প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে Indian Broadcasting Company-র একটিমাত্র সর্ত ছিল - নিয়মিতভাবে শ্রোতার সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক একজনকে কিভাবে কাজ করতে হতো তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি - নাটক বিভাগের দায়িত্ব ছাড়াও মহিলা মজলিশের ভার ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণর ওপর যিনি বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে মহিলা মজলিশ পরিচালনা করতেন, বিরূপাক্ষ নামে সরস গল্পের আসরে গল্প বলতেন, আবার স্বনামে সবিনয় নিবেদন প্রোগ্রামে, শ্রোতাদের পত্রোত্তর দিতেন। সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার, যিনি প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরে অনেক বছর বেতার জগতের সম্পাদনা করেছেন, তামাশা করে বলতেন - রেডিওতে বীরেন ভদ্র হলো গিয়ে আলুবিশেষ - ঝালে - ঝোলে - চচ্চড়ি - কালিয়া - এমনকি সেদ্ধতেও উপাদেয়। তিনি গ্রন্থনা করেন, সবিনয় নিবেদনে চিঠির উত্তর দেন, গল্প বলেন, নাটক করেন, প্রয়োজনে ঘোষকের চেয়ারেও বসে পড়তে পারেন, পিয়ানো বাজান, আবার উদাত্ত কণ্ঠে শ্লোক পাঠ করতেও তাঁর জুড়ি নেই।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নামটির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি, মহালয়ার সকালে মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানে শ্লোকপাঠের জন্য। একথা ঠিক যে মহিষাসুরমর্দিনী আকাশবাণী কলকাতাকে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দিয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় যদি কখনও আকাশবাণী কলকাতার সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা হয়, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র - এই দুটি নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে। রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাঁরা এক অসাধারণ সমাজসংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা আর creativity-র ফলে প্রথম থেকেই কলকাতা রেডিওর অনুষ্ঠানগুলি অন্যান্য সব রেডিও স্টেশনের থেকে অনেক বেশী সমাজসচেতন আর অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বিভাগের অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে, গত একশো বছরের বাঙালী জীবনের যে সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, তার থেকেই চোখে পড়ে, কিভাবে রেডিওর মাধ্যমে বড় বড় সামাজিক বিবর্ত্তন এসেছিল।

প্রথমেই নাটক বিভাগের কথা বলি। ১৯২৭ সালে কলকাতা শহরে সবথেকে জনপ্রিয় বিনোদন ছিল নাটক, তাই ঠিক করা হয় শুরু থেকেই রেডিওতে নাটক প্রচার করা হবে। রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে চুক্তি করে শুক্রবার সন্ধ্যায়, মঞ্চ থেকে সোজা রীলে করে নাটক শোনানো দিয়ে, বেতারে নাটকের শুরু। কিন্তু কয়েকবার এইভাবে রীলে করেই দেখা গেল অনেক রকমের অসুবিধা - যেমন, মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রীরা যখন কথা না বলে শুধু অভিনয় করেন, তখন রেডিওতে সব শুনসান - আবার কিছু দৃশ্যে যখন দর্শক উত্তেজিত হয়ে জোর হাততালি দেয়, রেডিওতে সংলাপ চাপা পড়ে যায়। অভিনেতা যখন স্টেজে ফিশফিশ করে কথা বলছে, তখন রেডিওর শ্রোতা প্রম্পটারের গলা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। এইসব অসুবিধা দেখে ঠিক করা হলো, বেতারের নিজস্ব নাটক ও অভিনয়ের দল তৈরী করতে হবে। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রী পাওয়া খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, কারণ মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই কোনো না কোনো থিয়েটার কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকতেন, অন্য কোথাও অভিনয় করতে গেলে বিশেষ অনুমতি লাগতো।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বাণীকুমার দুজনেই চিত্রাসংসদ নামে একটি সখের নাটকদলের সদস্য ছিলেন। তাঁরা চিত্রাসংসদকে দিয়ে, ১৯২৭ সালের শেষদিক থেকে, নতুনভাবে রেডিওর উপযোগী নাটক লিখিয়ে, রেডিওতে নাটক করাতে শুরু করলেন। পরিচালনা করতেন বীরেন্দ্র নিজেই। সেখানেও অসুবিধা দেখা দিল, কারণ দলে কোনো মহিলা অভিনেত্রী নেই। বাণীকুমার লিখেছেন - আমরা তখন প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টা করে চলেছি। এই চেষ্টারই অন্যতম ফলশ্রুতি বেতারে নাটকের অনুষ্ঠান। যতদূর মনে পড়ে, বেতারে প্রথম অভিনীত নিজস্ব নাটক ছিল, পরশুরামের **চিকিৎসঙ্কট**। আমরা, অর্থাৎ বীরেন্দ্র আর আমি, একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, নাম তার চিত্রাসংসদ। আমাদের বিশেষ অনুরোধে, চিত্রাসংসদের শিল্পীরা এই অনবদ্য কৌতুকনাটকটি বেতারে উপস্থাপিত করেন। বেতারে এই শ্রবণনির্ভর অভিনয় অনুষ্ঠান চারিদিকে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। আমরাও উৎসাহিত হয়ে আরো কয়েকটি বেতার নাটক তখন পরপর পরিবেশন করেছিলাম। সব নাম এখন আর মনে নেই, তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবুর কথা বেশ মনে আছে, কারণ চরিত্র খুঁজতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল।

মঞ্চের মতো বেতারেও প্রথম প্রথম ছেলেদের দিয়েই মেয়েদের রোল করানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে স্টেজে তুললে বেশীরভাগ সময়ে ধরা না পড়লেও, মাইক্রোফোনে ছেলের গলা মেয়ে বলে চালানো খুব শক্ত। তাছাড়া মঞ্চের অভিনেতারা হাত পা ছুঁড়ে, হেঁটে চলে অভিনয় করে অভ্যস্থ। তাঁরা কি পারেন, একটা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে, শুধুমাত্র গলা দিয়ে সমস্ত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে ? । কিন্তু বীরেন্দ্র তো হার মানার পাত্র নন । তিনি নিজে নিষিদ্ধপল্লীতে গিয়ে, বেতারে অভিনয় করার জন্য অভিনেত্রী খুঁজতে শুরু করেন। তাঁরই উদ্যোগে জোগাড় হলো একদল থিয়েটার পাগল, যাঁরা তখনও মঞ্চে তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেননি। তাঁদের নিয়ে তৈরী করলেন একটি দল - লোক তাদের ঠাট্টা করে বলতো - বেতার নাটুকে দল।

বেতারের জন্য নিজস্ব নাটক লেখাও শুরু বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উদ্যোগে। তিনি ঠিক করলেন রঙ্গমঞ্চে তো পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক, রহস্য-রোমাঞ্চ নাটক হচ্ছে, বেতার নাটকে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, সমাজ ও বাস্তব জীবনের ছবি তুলে ধরবেন। এই ভাবেই প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের ছোট গল্পের নাট্যরূপ দেওয়া শুরু। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা রেডিও নাটকের প্রথম যুগের একটা মজার গল্প শোনাই -

স্টেশন ডাইরেক্টার তখন স্টেপেলটন সাহেব। Sir Arthur Conan Doyle-এর উপন্যাস Hound of Baskerville গল্পের বাংলা নাট্যরূপ দেওয়া হলো রেডিওর জন্য। অভিনয়ের মহড়া শুরু হতে দেখা গেল রেডিওর স্টকে হাউন্ডের ডাক নেই । রেকর্ডে যে সব কুকুরের ডাক পাওয়া গেল পরিচালকের কোনোটাই পছন্দ হলনা । বেতারে তখনকার দিনে শব্দসম্রাট বলা হতো অজিত চট্টোপাধ্যায় নামে বীরেন্দ্রর এক সহকারীকে। তিনি যেকোনো শব্দ - পাখীর ডাক থেকে ইঞ্জিনের ধোঁয়া - সব স্টুডিওতে বসে তৈরী করে দিতে পারতেন। অজিতকে ডাকা হলো। সে এসে প্রথমে জানতে চাইল হাউন্ডটা মিস্টার না ম্যাডাম - মানে কুকুরটা male না female। মিস্টারের ডাক নাকি ম্যাডামের থেকে অনেক মোলায়েম। তারপর বল্লে, দুদিন সময় চাই। দুদিন রিহার্সাল বন্ধ রইল। দুদিন পরে অজিত এসে একরাশ কুকুরের ডাক শোনাচ্ছে, পাশেই ছিল স্টেশন ডাইরেক্টার স্টেপেলটন সাহেবের ঘর - তিনি কুকুরের ডাকের হট্টগোল শুনে হন্তদন্ত পায়ে দেখতে এলেন কি ব্যাপার। সব শুনে তিনি অজিতের কুকুরের ডাক একেবারে নাকচ করে বললেন তাঁর খাঁটি বিলিতী

স্প্যানিয়েল কুকুর আছে, তাকে নাটকের জন্য নিয়ে আসবেন। সাহের ডাইরেক্টার বলে কথা, কারো সাহস হলো না বলতে, স্প্যানিয়েল আর হাউন্ড একেবারে আলাদা জাত, ডাকও অন্যরকমের।

রিহার্সালে দেখা গেল কুকুরটি জাত অভিনেতা, ডাক যাই হোক, ইশারা করলেই ডাকতে পারে আর সাহেব মাথা নাড়লেই থেমে যায়। এল বহু প্রত্যাশিত অনুষ্ঠানের দিন - সোজা সম্প্রচার হবে। সারা অফিস ঝেঁটিয়ে এসেছে সাহেবের কুকুরের অভিনয় দেখতে। হয়তো ভীড় দেখেই সাহেব কুকুরের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, সে নাটক শুরু হবার আগে থেকেই পরিত্রাহি ডাক শুরু করে দিল, পারলে দু-চারজনকে কামড়েই দেয়। সাহেব বিস্কুট খাইয়ে কোনোমতে তাকে সামলে রাখতে চেষ্টা করলেন - সে বিস্কুট পেলেই চুপ করে যায়, কিন্তু না দিলেই কুঁই কুঁই করে কাঁদে। নিরুপায় হয়ে কুকুরের কান্নার সঙ্গে সাহেব নিজেই কুকুরের ডাক ডাকতে লাগলেন। নাটক তো এইভাবে broadcast হয়ে গেল, কয়েকদিন পর থেকে গাদা গাদা চিঠি আসতে শুরু করলো - সবেতেই প্রশ্ন, ডাকটা কার - কুকুরের না কচ্ছপের ?

কলকাতা রেডিও রঙ্গমঞ্চগুলির সঙ্গে চ্যলেঞ্জ নিয়ে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রেডিও নাটকের সময় অপরিবর্তিত রেখেছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সুদক্ষ পরিচালনায় বেতারের নাটক এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, শেষে রঙ্গমঞ্চের মালিকরা শুক্রবার সন্ধ্যার বদলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করেন। এখনো সেই tradition চলে আসছে। বেতার নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে মঞ্চের খ্যাতমানা অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও বেতারে আসতে শুরু করলেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বেতার জগতের অনুষ্ঠানসূচীতে দেখছি মঞ্চের দিকপাল - অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, মিস লাইট, নিভাননী, উমাশশী, সরযূবালা - সকলেই বেতারের নাটকে অভিনয় করছেন। পরবর্ত্তীকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এঁদের সঙ্গে একই নাটকে অভিনয় করিয়েছিলেন কণিকা মজুমদার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, নীলিমা দাস প্রমুখকে। এইভাবেই কুসংস্কার আর সংকীর্ণতা অতিক্রম করে সমাজকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল কলকাতা বেতার।

সঙ্গীত বিভাগে এই কাজটা হয়েছিল, সঙ্গীত শিক্ষার আসরের হাত ধরে। পঙ্কজ মল্লিক তখন রেডিওর সবথেকে ব্যস্ত গায়ক। যেমন উদাত্ত তাঁর গলা, তেমনই অপূর্ব তাঁর সুরসৃষ্টি। সঙ্গীত বিভাগের গল্প বলার আগে, তিরিশের দশকে পঙ্কজ মল্লিকের নিজের সুরে গাওয়া একটি গানের সামান্য অংশ শোনাচ্ছি -

নাও মালা নাও গলে - পঙ্কজ কুমার মল্লিক

পঙ্কজকুমার মল্লিক **আমার যুগ আমার গান** বইতে লিখছেন - যে কোনো সাংস্কৃতিক ব্যাপারেই সামাজিক রক্ষণশীলতা সে যুগে একটি দুস্তর প্রতিবন্ধক ছিল। ছেলেমেয়েদের গানবাজনা করা সেকালে বড়দের চোখে ছিল লেখাপড়ার বিঘ্নস্বরূপ। থিয়েটার দেখা, নভেল পড়াও তাই। এই একই বাধা কাজ করেছিল বেতারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে বেতারে দুটো প্রধান দিক - সঙ্গীত আর নাটক - পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল গুটিকয়েক পেশাদার অভিনেতা আর গায়ক-গায়িকার ওপর। সঙ্গদোষের ভয়ে, সাধারণ সমাজের সুকণ্ঠী ও সুগায়ক পুরুষরাও, এগিয়ে এসে বেতারের সঙ্গীত বিভাগে যোগ দিতে, সাহস পেতেন না। এই ধরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হতেই আমার মনে সঙ্গীত শিক্ষার আসরের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল।

ইচ্ছেটা সৎ ও সাহসী থাকলে অযাচিত সাহায্যও আসে। একটা ঘটনা আসর শুরু করার অল্পদিন পরেই ঘটেছিল যার ফলে আমরা তো প্রভূত আনন্দ ও উৎসাহ পেলামই, গান নিয়ে সামাজিক রক্ষণশীলতাও কিছুটা শিথিল হয়ে গেল। ১৯৩২ সালের শুরুর দিকের ঘটনা। সঙ্গীত শিক্ষার আসরের পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, হঠাৎ এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি, রেডিও অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। নাম বললেন - যোগীন্দ্রলাল রায়, ঢাকার কোনো এক অঞ্চলের জমিদার। নেপেনদা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি তাঁর ঘরে গেলে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে, নেপেনদা বললেন - "এই ভদ্রলোক সঙ্গীত শিক্ষার আসরের ব্যাপারে খুব আগ্রহী, ঢাকা থেকে এসেছেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে"।

যোগীন্দ্রলালবাবু বোধকরি আমার তরুণ চেহারা দেখে বিশ্বাস করতে পারেননি যে আমিই সেই আসরের গুরুগম্ভীর মাষ্টারমশাই। বেশ একটু হতাশ হয়েই বললেন - "আরে আপনি তো দেখছি নিতান্ত ছেলেমানুষ। রেডিওতে আপনার গম্ভীর কণ্ঠ আর গান শেখানোর পদ্ধতি লক্ষ্য করে আমার ধারণা হয়েছিল আপনি বেশ রাশভারী বয়স্ক লোক"।

অতঃপর যোগীন্দ্রলালবাবু জানালেন যে তিনি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন এই আসরে একটা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হোক - প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি পুরষ্কার স্বরূপ স্বর্ণপদক, তিনিই দান করবেন।

অযাচিত এই প্রস্তাবটি নেপেনদা তৎক্ষণাৎ লুফে নিলেন। **বেতার জগৎ** পত্রিকাতে প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হলো। আমাদের তখন দরকার মহিলা কণ্ঠের শিল্পী, তাই ঠিক হলো একটি স্বর্ণপদক মহিলা শিল্পীদের জন্য রাখা হবে। প্রতিযোগিতার দুটি শর্ত রাখা হলো - প্রতিযোগীকে প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষার আসর শোনেন এবং আগে কখনও বেতারে কিম্বা কোনো জলসায় গান করেননি। বিচারকদের মধ্যে আমি তো ছিলামই, তাছাড়া ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার, রাইচাঁদ বড়াল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মতো বিদগ্ধ মানুষরা।

যথাসময়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল, দেখা গেল মোট কুড়ি-পঁচিশজন প্রতিযোগী এগিয়ে এসেছেন যোগ দিতে, অধিকাংশই মহিলা এবং প্রথম তিনটি স্থান যাঁরা অধিকার করেছিলেন, তাঁরা তিনজনই মহিলা। তাঁরা কেবল স্বর্ণপদক পুরষ্কারই পেলেন না, বেতারে নিয়মিত গান গাইবার সুযোগও লাভ করলেন। এইভাবেই আমরা মধ্যবিত্ত সমাজকে রেডিওর অনুষ্ঠানে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম।

পুরস্কার যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি নাম পাচ্ছি কুমারী সাবিত্রী বসু। পুরস্কার পাবার পরে তিনি মাঝেমাঝে বাবার সঙ্গে বেতারে গান গাইতে আসতেন। প্রোগ্রামের আগে তাঁর বাবা রেডিও স্টেশনে গিয়ে কারা সেদিন ডিউটিতে থাকবেন, কারা তবলা হারমোনিয়ামে সঙ্গত করবেন, সব দেখে আসতেন। প্রোগ্রামের দিন যতক্ষণ মেয়ে গান করতেন, বাবা মেয়ের পাসে স্টুডিওর ভেতরে বসে থাকতেন। কয়েক বছরের মধ্যেই কিন্তু ছবিটা বদলে গিয়েছিল - সাবিত্রী গ্রামাফোন কোম্পানী থেকে ডাক পেলেন, গানের খ্যাতি থেকেই বিয়ের প্রস্তাব এলো - সাবিত্রী বসুই চল্লিশের দশকের বাংলা আধুনিক গানের জনপ্রিয় শিল্পী সাবিত্রী ঘোষ। তাঁর গলায় অনেক কালজয়ী গান আজকাল রিমেকও হচ্ছে। জনশ্রুতি আছে হিমাংশু দত্তর সুরে বিখ্যাত চামেলী সিরিজের গান সাবিত্রী ঘোষের জন্যই তৈরী হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে গৃহীত সেই সিরিজের প্রথম গানটি শোনাচ্ছি -

নিশীথে চলে হিমেল বায় - সাবিত্রী ঘোষ

সাবিত্রী ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন - বিয়ের আগে কেবল বর্ধিষ্ণু পরিবারে বাড়ির অন্দর মহলে গানবাজনা হলেই যেতাম। তখনকার দিনে এমনটাই রীতি ছিল। পেশাদার শিল্পীরাই রেডিওতে গাইতেন - তাঁরা ভক্তিসঙ্গীত, নজরুলগীতি, নাটকের গান সবই গাইতেন, যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন তখন ঘোষক শিল্পীর নাম ঘোষণা করে বলতো এবারে শুনুন রবিবাবুর গান। উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রথম মহিলা যিনি রেডিওতে এসে গান করেন তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলা দাশ। তিনি শুধুমাত্র ভক্তিমূলক গানই করতেন। ১৯৩১ সালে রেডিওতে যখন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়, সেই উপলক্ষ্যে গাস্টিন প্লেসের স্টুডিওতে গান গাইতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের দুটি ছাত্রী -ক্ষণিকা দেবী ও রমা দেবী, তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ নিজে। ১৯৩৪ সাল থেকে আমি ছাড়া, দুজন মহিলা শিল্পী নিয়মিত গান গাইতে আসতেন রেডিও স্টেশনে - তাঁরা হলেন শৈল দেবী আর ইন্দুলেখা ঘোষ। সামাজিক বাধা ছাড়াও মহিলাদের রেডিওতে যাওয়া আসা করাও, সেসময়ে একটা অসুবিধার ব্যাপার ছিল। আমাদের একা একা রাস্তায় চলাফেরা করার অভ্যাস ছিলনা। রেডিও স্টেশনের কর্তারা অবশ্য প্রত্যেক মহিলা শিল্পীকে স্টুডিওতে গাড়ী করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতেন, প্রোগ্রাম শেষ হলে বাড়ী পৌঁছেও দিতেন। পেশাদার মহিলা শিল্পীরাও গাড়ীর সুবিধাটা পেতেন।

গাড়ী নিয়ে শিল্পীদের মধ্যে রেশারেশিও কম হতো না। একবার একই দিনে সামান্য সময়ের তফাতে আঙুরবালা এবং ইন্দুবালার গান ছিল। দুজনে একই সঙ্গে রেডিও স্টেশনে ঢুকছেন, ইন্দুবালা দেখলেন তাঁকে ঘোড়ায় টানা গাড়ি পাঠানো হয়েছে আর আঙুরবালা এসেছেন মোটরগাড়ী চড়ে। দেখে ইন্দুবালা এত রেগে গেলেন যে তিনি বলে দিলেন সেদিন আর প্রোগ্রাম করবেনই না, তখনই বাড়ি চলে যাবেন। স্টেশন অধিকর্তা অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে গান করতে সম্মত করান। রফা হলো যে ফেরার সময় তিনি মোটর গাড়ী চড়ে বাড়ী যাবেন, আঙুরবালাকে ঘোড়ার গাড়ীতে বাড়ী পাঠাতে হবে। জানতে পেরে আঙুরবালা ইন্দুবালার থেকেও বেশী ক্ষেপে উঠলেন। সেদিন কাজীসাহেব নজরুল ইসলাম মধ্যস্থতা না করলে, আঙুরবালা রেডিওতে আসাই বন্ধ করে দিতেন।

তিরিশের দশক থেকেই রেডিওতে নিজস্ব গান তৈরী শুরু হয়। গীতিকার-সুরকাররা রেডিওর জন্য গান তৈরী করতে উৎসাহ পেতেন, কারণ গান তৈরীর ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা থাকতোনা। তাছাড়া, গান রেডিওতে জনপ্রিয় হলে, সেগুলো আবার গ্রামাফোন কোম্পানী নতুন করে রেকর্ড করে, বাজারে নিয়েও আসতো। ১৯৩৯ সালে হিমাংশু দত্তের সুরে রেডিওর জন্য তৈরী হয় একটি গান, যে গান পরবর্ত্তীকালে বহুভাবে রিমেক হয়েছে - সাবিত্রী ঘোষ থেকে ছায়া দেবী, শ্যামল মিত্র থেকে কুমার শানু, কবীর সুমন, রেজওয়ানা বন্যা চৌধুরী - এখনও রিমেক হয়ে চলেছে। ১৯৩৯-এ তৈরী সেই গান মাধুরী সেনগুপ্তর গলায় প্রথমে শোনাচ্ছি তার পরে শুনুন শ্যামল মিত্রের যাটের দশকের রিমেক -

তোমারি পথপানে চাহি - মাধুরী সেনগুপ্ত, শ্যামল মিত্র

সঙ্গীত আর নাটকের সঙ্গে সঙ্গে, শুরু থেকেই কলকাতা রেডিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিত্তিক অনুষ্ঠানও করতো। প্রোগ্রাম পরিচালকরা শুধুমাত্র বহুজন সুখার্থে রেডিওকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, কথিকা, আলোচনা, বার্তা, নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের নতুন ভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, নতুন যুগের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। রেডিওর সবথেকে বিখ্যাত অনুষ্ঠান মহিষাসুরমর্দিনীর ইতিহাসের দিকে তাকালে অবাক হতে হয় - কি অসম্ভব দৃঢ়তার সঙ্গে অনুষ্ঠান অধিকর্তা সেযুগের সামাজিক রক্ষণশীলতা আর কুসংস্কার উপেক্ষা করার সাহস দেখিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে বেতার জগৎ পত্রিকায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখছেন -

সালটা ছিল ১৯৩১। আমরা মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন বাঙালী প্রোগ্রাম চালাই, শ্রোতার সংখ্যা বিরাট ছিলনা, অর্থও পর্য্যাপ্ত ছিল না, বহু কষ্ট ক'রে ও অসাধারণ শ্রম স্বীকার করে, প্রোগ্রাম চালাতে হতো

দুপুর বেলায় আমাদের হতো একটা বিরাট আড্ডা - সেখানে সাহিত্য, সংগীত, অভিনয়, গান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা যে কতক্ষণ চলত তার ঠিক নেই। আড্ডার একটা নিয়ম ছিল - প্রত্যেক আড্ডাধারীকে সপ্তাহে অন্তত একটা ক'রে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে নতুন নতুন পরিকল্পনা পেশ করতে হবে। প্রধান উদ্দেশ্য, শ্রোতার সংখ্যা আরো কী করে বাড়ানো যায়।

হঠাৎ একদিন বেতার জগতের সম্পাদক প্রেমাঙ্কুরবাবু, যাঁকে সবাই বুড়োদা বলে ডাকতাম, বলে উঠলেন - দেখো, রোজ রোজ গান, বাজনা, বক্তৃতা, থিয়েটার, গল্পদাদুর আসর, মহিলা মজলিস এসব তো চলছেই - কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা বাড়াতে যদি চাও, ধাক্কা দিতে হবে শ্রোতাদের।

নৃপেনবাবু হেসে বলে উঠলেন - আর কত ধাক্কা দেওয়া যায় ভাই, সকাল থেকে রাত অবধি তো এই কটা লোক প্রোগ্রাম চালাচ্ছে - এর ওপর আবার কী করা যাবে বলো ?

বুড়োদা বললেন - করা যাবে না কেন ? ধরো, আমরা একদিন রাত দশটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত বড়ো বড়ো গাইয়ে-বাজিয়েদের নিয়ে একটা জলসা বসালুম, যেমন বড় বড় জমিদার বাড়িতে হয়, সেখানে তো আর সবাই ঢুকতে পারেনা, আমাদের প্রোগ্রাম সবাই শুনতে পারবে। রাত্তিরে যেসব রাগ বাজালে বা গাইলে জমে, শিল্পীদের শুধু সেইগুলিই গাইতে বাজাতে বলা হলো - তখনই শ্রোতাদের কাছে একটা চমকপ্রদ প্রোগ্রাম বলে মনে হবে। কোনোদিন হয়তো ভোর চারটে থেকে প্রোগ্রাম শুরু করে দিলুম, সেটাও একটা নতুনত্ব হবে।

অনেকেই বললেন - হ্যাঁ, বুড়োদার প্রস্তাবটা মন্দ নয়, এধরণের আকস্মিক ব্যবস্থায় আর কিছু হোক-না-হোক, একটা নতুনত্ব হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নৃপেনবাবু বললেন - সেইরকম একটা প্রোগ্রাম কী করা যায় সবাই ভাবো দেখি - বুড়োদা তুমিও আর একটু বিশদ করে বলো, শুনি।

বুড়োদা বললেন - এই তো বাণী রয়েছে - সংস্কৃতের তো আদ্যশ্রাদ্ধ করেছে - ওই কতকগুলো বৈদিক শ্লোক জোগাড় করে ফেলুক, আর গান লিখুক, রাই সুর দিক, বীরেন শ্লোক আওড়াক - ভোরবেলা লাগিয়ে দাও, লোকের লাগবে ভালো ।

যোগেশদা, রাজেনবাবু, আরো কয়েকজন হেসে বললেন - লোকের ভালো লাগুক আর না-লাগুক, আমাদের একটা নতুনত্ব করার খেয়াল চরিতার্থ হবে।

বুড়োদা বললেন - কেন, তোমরা কি সন্দেহ করো, লোকে শুনবে না ?

দু-একজন বললেন - সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, লোকে নিশ্চিত, সে সময় ঘুমুবে।

নৃপেনবাবু বিরুদ্ধবাদীদের বাধা দিয়ে বললেন - ঘুমুক গে, নাহয় আমরাই প্রোগ্রাম শুনব। ওহে বাণী, একটা কিছু লিখে ফেলো। একটু সহজ কিছু লিখো বাপু, নইলে আমরাও প্রোগ্রাম করতে করতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব।

তখন আমি বললাম - নৃপেনদা, পুজো আসছে আর মাসখানেক বাদে, প্রতি পুজোর সময় আমি এক জায়গায় ঠাকুরের সামনে ব'সে চন্ডীপাঠ করি - খানিকটা সড়োগড়ো আছে। শ্রী শ্রীচন্ডীর কাহিনী নিয়ে যদি বেশ গান, টান, শ্লোক লাগিয়ে, একটা প্রোগ্রাম করা যায়, তাহলে প্রোগ্রাম লোকে পছন্দ করুক না-করুক - দু-চারজন যারা ঘুম থেকে ভোরবেলা উঠে আমাদের প্রোগ্রাম শুনবে, হয়তো তাদের ভাল লাগতে পারে ।

সকলে বলে উঠলেন - হ্যাঁ, বীরেন যা বলেছে, বেশ ভাল প্রস্তাব, পুজোর সময় চন্ডীপাঠ লাগিয়ে দাও

এর মধ্যে আবার একজন খুঁত ধরলেন । বললেন - বীরেন তো বামুন নয়, কায়েতের ছেলে, সে কি করে চন্ডীপাঠ করবে ? লোকে কিছু বলবে না তো ? বাকীরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে লাগলেন।

নৃপেনবাবু বললেন - প্রোগ্রাম করবে, তার আবার বামুন কায়েত কী হে ? আমরা কী হিন্দুর মন্দিরে গিয়ে পুজো করছি নাকি ? এই প্রোগ্রামে যাঁরা গাইবে, তাঁদের অনেকেরই জাতই নেই, ঠিকানা নিষিদ্ধ পল্লীতে, যাঁরা বাজাবে তারা তো অর্ধেক মুসলমান - খুশি, মহম্মদ আলী, মুন্সী, এঁরাই তো বাজাবে, তাহলে তাদের বাদ দিয়ে, ব্রাহ্মণ গাইয়ে বাজিয়ে ডেকে আনতে পারো কিনা দেখি ? তা ছাড়া আমরা একটা বিরাট উৎসবের আগে, ভূমিকা হিসেবে একটা প্রোগ্রাম করব - এতে কার কী বলার আছে ? প্রোগ্রামটা আসলে লিখবে তো এক ভটচায বামুন - কী বল হে বৈদ্যনাথবাবু ?

বাণীকুমার হেসে বললেন - বটেই তো। ও-সব কথা ছেড়ে দিন-না, আমি বীরেন ছাড়া কাউকে চন্ডীপাঠ করতেই দেবো না।

নৃপেনদার চেষ্টায় বেশ বড়সড় বাজেট সমেত প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। হপ্তাখানেকের মধ্যে বাণীকুমার কতকগুলো গান লিখে ফেললেন, পন্ডিত হরিশচন্দ্র বালী, রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজকুমার মল্লিক সেগুলিতে সুর সংযোগ করতে লাগলেন।

অখিল বিমানে আলোকের গানে সুর হরিশ বালীর দেওয়া, সাগির খাঁর সুরে তৈরী হলো - **শান্তি ভরি দিলে**, রাইচাঁদ বড়াল **নিখিল আজি সকল ভোলে** গানটির সুর দেন, এছাড়া অধিকাংশ গানের সুর পঙ্কজের দেওয়া।

রাইচাঁদ এক বিশাল অর্কেস্ট্রার পরিকল্পনা করলেন। সেকালের সবথেকে বড়ো বড়ো বাজিয়েরা সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। সারেঙ্গী ধরলেন মুন্সী, চেলো বাজালেন তাঁর ভাই আলী, হারমোনিয়াম খুসী মহম্মদ, প্রথম বেহালা অবণী মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বেহালা তারকনাথ দে, ম্যান্ডোলীন সুরেন পাল, গীটার সুজিত নাথ, এসরাজ দক্ষিণামোহন ঠাকুর, ডবল বাস্ শান্তি ঘোষ, পিয়ানো আর অর্গান রাইচাঁদ নিজে। প্রধান গায়ক ছিলেন পঙ্কজ, আর বিমলভূষণ আর তাদের সঙ্গে আভাবতী, মাণিকমালা, প্রফুল্লবালা, বীণাপাণি, প্রভাবতী। অনুষ্ঠান এত সমাদৃত হয়েছিল যে পরের বছর থেকে তখনকার কালের যাঁরা শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা ছিলেন, তাঁরা এগিয়ে এলেন, একক না হলেও কোরাসে অংশগ্রহণ করার জন্য। সত্যি কথা বলতে কী, পরে এই অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, শৈলদেবী, রাধারাণী, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, সুপ্রভা সরকার, কত শিল্পী যে অংশ গ্রহণ করেছেন, সবার নাম মনে রাখা সম্ভবপর নয়।

এইভাবেই রেডিওর হাত ধরে আস্তে আস্তে কলকাতার সামাজিক জীবনেও একটা বদল এসেছিল। প্রথমদিকে রেডিওতে গান করতে আসতেন শুধু পেশাদার গায়িকারা - আঙুরবালা ইন্দুবালা, প্রফুল্লবালা, মিস্ বীণাপানি, উষারাণী, মানদাসুন্দরী দাসী। ১৯৩৬ থেকে এঁদের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামে স্টুডিওতে আসতে শুরু করেন উমা বসু, বিজয়া দাস, যাঁকে আমরা সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বলে চিনতাম, অমিতা সেন, সুপ্রভা সরকার, পরবর্ত্তীকালে অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা। নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার নিয়ে এসেছিলেন নিজের আত্মীয়া সুপ্রীতি ঘোষকে। এই সব শিল্পীদের নাম এই প্রজন্মের কাছে হয়তো অজানা, কিন্তু সেই সময়ে এইসব মহিলা শিল্পীরা সামাজিক বাধা অগ্রাহ্য করে রেডিওতে এসে কতবড় সামাজিক বিপ্লব এনেছিলেন সেটা মূল্যায়ন করা যায়না।

কলকাতার মানুষের সমাজচেতনায় পরিবর্ত্তন ও আধুনিকতার ছোঁয়া আনার পেছনে রেডিওর এই অবদান কিন্তু আজও সকলের অলক্ষ্যে রয়ে গেছে । বিজয় দাসের গাওয়া একটা দুষ্প্রাপ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনাদের শোনাই -

স্বপ্নে আমার মনে হলো - বিজয়া দাস

তিরিশের দশকে রেডিওর জগতে কয়েকটা বিশাল বদল এসেছিল যার ফলে মেয়েদের রেডিওতে যোগদানের ব্যাপারটাও একটা গতি পায় । Indian Broadcasting Company মাত্র পনের লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল, রোজগার বলতে ছিল শুধু ১৫ টাকা annual লাইসেন্স ফি । যথেষ্ট লাইসেন্স ফি না পাওয়ায়, দুবছরের মধ্যেই কোম্পানীর লাটে ওঠার অবস্থা হয় । তখন ভারত সরকার কোম্পানীটি অধিগ্রহণ করে । ১৯৩২ সাল থেকে রেডিও স্টেশন হয়ে গেল একটি সরকারী অফিস । মোটামুটি সেই সময় থেকেই রেডিও সেটের দাম কমতে শুরু করায় মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে রেডিও কেনাও তুলনায় সহজসাধ্য হয়ে যায় । মধ্য তিরিশ থেকে কলকাতা শহরে রেডিও হয়ে উঠেছিল সবথেকে সস্তা কিন্তু সবথেকে বৈচিত্রময় বিনোদন, আর সেই সঙ্গে সরকারী তকমা পাবার পর, সবথেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র । প্রোগ্রামের আকর্ষণীয় content, variety আর সরকারী তকমার ফলে সব শ্রেণীর মানুষের জন্য রেডিও হয়ে উঠল একটি সম্মানীয় সংস্থা । ততদিনে গান্ধীজির ডাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে অনেক মেয়ে বাড়ীর বাইরে পা রেখেছে । মেয়েদের চাকরী করা তখনও তেমন একটা প্রচলন হয়নি কিন্তু রেডিওতে গান করে, অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে, মহিলা মজলিশে গল্প-কবিতা পাঠ করে, অনেক মহিলাই সামান্য হলেও নিয়মিত রোজগার করছেন । তাই অল্প বয়সে দুটি শিশুপুত্র নিয়ে বিধবা হবার পর, ইন্দিরা দেবী যখন ঠিক করলেন নিজেকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে, তখন রেডিওর কথাই তাঁর প্রথমে মনে হয়েছিল । নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে সামান্য জানাশোনা ছিল । তাঁরই আশ্বাসে সাহস করে, চারদেয়ালের বাইরে এসে রেডিও অফিসে চাকরী নিলেন সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের শিক্ষিতা বধূ ইন্দিরা দেবী । ইনিই প্রথম বাংলা মহিলা ঘোষিকা । এঁকে পরবর্ত্তীকালে আমরা শিশুমহলের ইন্দিরাদি বলে চিনেছি ।

বছর খানেক পরে ১৯৪৫ সালে, এলেন বেলা দে। তিনিও পারিবারিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে যাওয়ায় মানসিক শান্তির খোঁজে রেডিওতে এসেছিলেন। বেলা দে তাঁর জীবনে আকাশবাণীর অবদান সম্পর্কে লিখছেন - বীরেনদার সঙ্গে আমার মামা ডাঃ কালিদাস নাগের পরিচয় ছিল, সেই সূত্রেই খবর পেয়েছিলাম বেতারে চাকরী পাওয়া যেতে পারে। সে যুগে উত্তর কলকাতার এক বনেদী বাড়ীর মেয়ে ও বনেদী পরিবারের বধূর বেতারে চাকরী করা, পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজনেরা ভালো মনে নিতে পারেনি, আড়ালে আবডালে সকলেই ছি ছি করে উঠেছিল। কিন্তু তাদের সেই অলস নিন্দামন্দের আলাপে কান না দিয়ে আমি বেতারে কাজে ঢুকলাম। তখন রেডিওতে মেয়ে বলতে গেলে ছিলইনা। আমার আগে বেতারে কাজ করতে শুরু করেছিলেন ইন্দিরাদি আর আমার কয়েকমাস পরে এলেন নীলিমা সান্যাল। এসে দেখলাম আকাশবাণীতে সারাক্ষণই কাজ, সেখানেই মন প্রাণ ঢেলে কাজের পরিকল্পনা করে, সহকর্মীদের ভালোবাসা আর সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আমার ভাঙাচোরা মনটাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দিয়েছিলাম। কবে যে জোড়া লেগে গিয়েছিল, ১৯৮২ সালে অবসর গ্রহণের আগে জানতেও পারিনি। বেতার ছিল আমার জীবনের সাধনার স্বর্গ।

পঞ্চাশ ষাটের দশকে ইন্দিরাদির পরিচালনায় শিশুমহল আর বেলা দের পরিচালনায় মহিলামহল কিরকম জনপ্রিয় হয়েছিল নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। উলবোনা থেকে রান্না - কি না রেডিওর মাধ্যমে শেখাননি বেলা দে। নিজে কিন্তু কোনোটাই করতে জানতেন না। সংসারে কেউ ছিলনা যার জন্য তাঁর উলবোনার দরকার হতো, আর রান্না ? একান্নবর্ত্তী বাড়ীতে রান্নাঘরের কাজ যখন শুরু হতো, তখন তো তিনি অফিস করতেন ! সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী কিছুদিন কলকাতা রেডিওর অধিকর্তা ছিলেন। তিনি নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো, আড্ডার আসর জমিয়ে প্রোগ্রাম আলোচনা নতুন করে প্রবর্তন করেন। খাদ্যরসিক আলীসাহেব মাঝেমাঝেই সেই আড্ডায় ভালোমন্দ খাবারের ব্যবস্থা করতেন। আলীসাহেব কিন্তু কখনই বেলা দে-কে খাবার বানিয়ে আনতে বলতেন না। কেউ সে নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাঁর উত্তর ছিল - ওরে বাবা, বেলা তো মাইক্রোফোন আর টেপ নিয়ে রান্না করে, ওসব আমি খেতে পারবো না ! এইরকম সরস সুন্দর পরিবেশ তৈরী করে রেডিও মহিলাদের অফিস করতে আসা সহজ করেছিল।

চল্লিশের দশকেই রেডিওতে যোগদান করেছিলেন সাহিত্যিক লীলা মজুমদার আর কবিতা সিংহ। চল্লিশের শেষভাগে Western Music Section -এ এলেন বুলবুল সরকার। বুলবুল সরকারের এক অসামান্য অবদান - তিনিই কলকাতা শহরের সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে বিদেশী সঙ্গীত জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁর আগে, এই বিভাগটি ছিল ইংরেজ প্রোগ্রাম পরিচালকদের হাতে, তাঁরা প্রধানতঃ বিদেশী ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখে প্রোগ্রাম করতেন। বুলবুল সরকার প্রোগ্রামে সব বর্গের শ্রোতাকে নিয়ে এলেন - মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতা পেল বিদেশী সঙ্গীতের টুকরো টুকরো খবরাখবর, পরিচিত হলো পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের নানারকমের ধারার সঙ্গে, সুযোগ পেল অনুষ্ঠানে যোগদান করতে।

চল্লিশের দশকে সঙ্গীতের আর একজন কিংবদন্তী মানুষ রেডিওতে এসেছিলেন। তাঁর নাম জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। রেডিওর মাধ্যমে বাংলা আধুনিক গানের জগতে তিনি এক অসাধারণ জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। চল্লিশের দশক পর্য্যন্ত রেডিওর কোনো প্রোগ্রামের নিজস্ব পরিচয়জ্ঞাপক সুর - অর্থাৎ Signature Tune ছিলনা। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এসে প্রথমেই সেখানে একটা নতুনত্ব আনলেন - প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের চরিত্র অনুযায়ী একটা করে Signature Tune তৈরী করে দিলেন - শিশুমহলের জন্য তৈরী করলেন, বিখ্যাত বিদেশী রূপকথা Pied Piper of Hamlyn-এর অনুপ্রেরণায়, অলোকনাথ দের বাঁশীর সুরে, সন্মোহিনী এই সুর -

Signature Tune - শিশুমহল

মহিলা মহলের জন্য তৈরী করলেন রবীন্দ্রনাথের "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান" গানটির সুর ভেঙে Signature Tune -

Signature Tune - মহিলামহল

মজদুরমন্ডলীর জন্য নানারকমের বাদ্যযন্ত্র দিয়ে তৈরী করেছিলেন কলকারখানার পরিচিত আবহ, আবার পল্লীমঙ্গল আসরের জন্য বাঁশী আর দোতারার সাহায্যে গ্রামবাংলার মেঠো পরিবেশ। এই সব Signature Tune গুলোর নিজস্ব একটা পরিচিতি আর আকর্ষণও ছিল। পঞ্চাশের দশক থেকে কলকাতা রেডিওতে প্রায় সব নিয়মিত প্রোগ্রামের আগে Signature Tune বাজানো শুরু হয়।

পরবর্ত্তীকালে ভারতের সব রেডিও স্টেশনেই বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামের জন্য Signature Tune-এর প্রচলন করা হয়েছে, প্রোগ্রামের আগে Signature Tune বাজানোর প্রথা কিন্তু কলকাতা রেডিও থেকেই শুরু।

পঞ্চাশের দশক বলা যেতে পারে রেডিওর একটা watershed decade - ছাপ্পান্ন সালে ভারত সরকার অল ইন্ডিয়া রেডিওর নতুন নামকরণ করলেন - আকাশবাণী। এইখানে বলে রাখি নামটার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ নেই। ১৯৩৬ সালে বেতার জগতের সপ্তম বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন -

ধরার আঙিনা হতে, ওই শোনো উঠিল আকাশবাণী
অমরলোকের মহিমা দিল যে মর্ত্যলোকেরে আনি,

কিন্তু এর আগে, ১৯৩৫ সালে, M.V. Gopalaswami নামে মহীসূর কলেজের এক সাইকোলজির প্রোফেসর নিজের বাড়ীতে ভারতের প্রথম প্রাইভেট স্টেশন শুরু করেন - নাম দিয়েছিলেন **আকাশবাণী মাইসুর**। ১৯৫৬ সালে নতুন নামকরণের সময় আকাশবাণী নামটা সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছিল ।

সেসময়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ছিলেন বি. ভি. কেসকার। কেসকারের উদ্যোগে special budget sanction করে সর্বভারতীয় স্তরে Light Music Section খোলা হয় প্রত্যেক রেডিও স্টেশনে। উদ্দেশ্য গ্রামাফোন রেকর্ডের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আকাশবাণীর নিজস্ব আধুনিক গান তৈরী করা। কলকাতায় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে এই বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানেই বাংলা আধুনিক গানে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এনেছিলেন এক অসাধারণ বিপ্লব। লোকসঙ্গীত থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্গীত - নানা ধরণের সুরের, তালের, অর্কেস্ট্রার মিশ্রণ করে গান তৈরী শুরু হলো। আনলেন নতুন গীতিকার, সুরকার, গানের আবহ সঙ্গীতে আনলেন বৈচিত্র্য। ভি বালসারা, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, আলোকনাথ দের মতো দিকপাল যন্ত্রশিল্পীদের করে তুললেন কালজয়ী সুরস্রষ্টা। কলকাতা আকাশবাণী এই নতুন গানের প্রোগ্রামের নাম দিয়েছিল - রম্যগীতির অনুষ্ঠান। সুরদাসের এক বিখ্যাত ভজন ভেঙে জ্ঞানপ্রকাশ তৈরী করেছিলেন রম্যগীতির Signature Tune

Signature Tune - রম্যগীতি

কেসকারের light music নিয়ে experiment ভারতের আর কোনো রেডিও স্টেশনে সফল হয়নি কিন্তু এর ফলে বাংলা আধুনিক গানে যে ব্যাপ্তি এলো, আজও বাংলা গানে সেই ধারা বয়ে চলেছে। প্রখ্যাত রাগসঙ্গীতের শিল্পী দীপালী নাগ, যিনি প্রায় কখনো আধুনিক গান করেননি, রম্যগীতিতে গানের জন্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের অনুরোধ ফেলতে পারেননি। ষাটের দশকে গৃহীত দীপালী নাগের গলায় সেই রাগাশ্রিত রম্যগীতিটি শোনাচ্ছি।

এসেছে শ্রাবণ নীপবনচ্ছায়ে - দীপালী নাগ

সঙ্গীতের প্রোগ্রাম, বিশেষ করে **মহিষাসুরমর্দিনী** কলকাতা আকাশবাণীকে যে বিশ্বচর্চিত মর্য্যাদার জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, রাজনীতির প্রোগ্রামে সেই সম্মান এনে দিয়েছিল এই প্রোগ্রাম -

Signature Tune - সংবাদ বিচিত্রা

সংবাদ বিচিত্রা। সালটা ছিল ১৯৭১। স্বাধীনতার দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠেছে, আকাশবাণী শোনার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পাকিস্তান সরকার। কিন্তু অধীর আগ্রহে, পূর্বপাকিস্তানের সময় সাড়ে দশটায়, অন্ধকার ঘরের কোণে, খুব সন্তর্পণে রেডিও চালিয়ে, বাংলাদেশের মানুষ অপেক্ষা করতো এই সুরটি শোনার জন্য - এই সুর মানে কলকাতা রেডিও থেকে সংবাদ পরিবেশন আরম্ভ হলো। সেই সময়ে প্রথম দশ মিনিট সংবাদ প্রচারিত হতো, তারপরে পাঁচ মিনিট সংবাদ পরিক্রমা - লিখতেন প্রণবেশ সেন, দৃপ্তকণ্ঠে শোনাতেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর সব শেষে উপেন তরফদারের প্রযোজনায় সংবাদ বিচিত্রা। পূর্ববাংলার মানুষ যুদ্ধের সব খবর পেতেন এই প্রোগ্রামটা থেকে। যুদ্ধের মধ্যেই পূর্বপাকিস্তানের মানুষ একদিন সংবাদ পরিক্রমা শুনে জানতে পারলো বঙ্গবন্ধু ঢাকায় জনসভা করবেন - বিখ্যাত সেই জনসভা যেখানে শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেছিলেন - এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেখ মুজিবরের সেই কণ্ঠস্বর বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল কলকাতা রেডিও। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলো আর এপারে কলকাতা আকাশবাণীতে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গান লিখতে বসলেন, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সুর করলেন আর অংশুমান রায় সংবাদ বিচিত্রায় বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের আহ্বানের সঙ্গে গেয়ে উঠলেন -

শোনো একটি মুজিবরের থেকে - অংশুমান রায়

সেদিনের সংবাদ বিচিত্রা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকা থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবী প্রাণ দিতে এগিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, পাকিস্তান বাধ্য হয়েছিল যুদ্ধে হার স্বীকার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে। পৃথিবীর খুব কম রেডিও স্টেশনের সৌভাগ্য হয়েছে এইভাবে একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার, কলকাতা রেডিওর সংবাদ বিভাগ সেই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী।

কলকাতা রেডিওর কথা বলতে গেলে এত কথা, এত গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটা জায়গায় থামতে তো হয়। বলা হল না কত রকমের বাধা অতিক্রম করে, কলকাতা বেতার, বাংলায় খেলার ধারাভাষ্য শুরু করেছিল। সেখানেও উৎসাহ আর সাহস দেখিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, মাত্র এক দশকের মধ্যে তৈরী করে নিয়েছিলেন কমল ভট্টাচার্য্য, অজয় বসু, পুষ্পেন সরকারের মতো কিংবদন্তী এক একজন ধারাভাষ্যকারকে। বলা হলো না গল্পদাদুর আসরে জয়ন্ত চৌধুরীর কথা, বলতে পারলাম না পল্লীমঙ্গল আসরে সুধীর সরকার কেমন করে গ্রাম বাংলার মানুষকে স্টুডিওর বদ্ধ পরিবেশে নিয়ে এসেছিলেন সেই চমকপ্রদ গল্প। কিন্তু এত কথা বলতে গেলে গোটা ব্যাপারটা ক্লান্তিকর একমুখী সংলাপ হয়ে উঠবে।

শেষ করার আগে একটা কথাই বলার আছে - কলকাতা রেডিও নিয়ে চর্চা অনেক হলেও, গবেষণা হয়নি। কলকাতা রেডিওর প্রোগ্রাম যে গবেষণার বিষয় হতে পারে, বিশেষ করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের social science department-গুলোতে, সেটাই এতদিন কেউ মানতে চাইতেন না। সাম্প্রতিক কালে রেডিওর ইতিহাস নিয়ে মাঝে মাঝে কথাবার্তা শুনতে পাই। সকলেরই একটাই অনুযোগ - তথ্যসূত্র পাওয়া যায়না। দুর্লভ হলেও কষ্ট করে খুঁজে বের করতে পারলে বেতার জগৎ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া শ্রী ভবেশ দাশ ও শ্রীপ্রভাতকুমার দাসের সম্পাদনায় **কলকাতা বেতার** নামে প্রামাণ্য বইটি প্রকাশিত হবার পরে অনেক অজানা তথ্য সামনে এসেছে। উৎসাহী শ্রোতারা বইটা পড়ে দেখতে পারেন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি বিশেষ ভাবে কৃতার্থ আকাশবাণীর শ্রী সিদ্ধার্থ মাইতির কাছে। দুর্লভ রেকর্ডিংগুলি শোনাতে আমাকে সাহায্য করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথা বিশ্বাস।

আমার কথাটি ফুরালো। এবার আপনারাই বিচার করুন কলকাতা বেতার, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে শুধু বাংলা নয়, এই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সত্যিই কলকাতার ঐতিহ্য কি না।